আত্মপরিচয়ের সন্ধানে

আত্মপরিচয়ের সন্ধানে

এবনে গোলাম সামাদ

আত্মপরিচয়ের সন্ধানে
এবনে গোলাম সামাদ

প্রকাশক	□	পরিলেখ ইউনিক প্যালেস, মির্জাপুর মতিহার, রাজশাহী-৬২০৬
প্রথম প্রকাশ	□	অক্টোবর ২০১৯
গ্রন্থস্বত্ব	□	লেখক
প্রচ্ছদ	□	আলি মেসবাহ
অক্ষরসজ্জা	□	আনোয়ার হোসেন এ্যাকটিভ কম্পিউটার, রাজশাহী
মুদ্রণ	□	জনতা প্রিন্টিং প্রেস বাংলা বাজার, ঢাকা
মূল্য	□	চারশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

Attoporichoyer Shondhane by Ebne Golam Samad
Published by Porilekh Rajshahi-Dhaka, Cover: Ali Mesbah
Date of Publication: October 2019, Price: 450.00 Taka only

ISBN: 978-984-94340-5-4

উ ৎ স র্গ

আমার নাতি ছেলে মোসাদ্দেক সামাদ

ও

মুনয়িম সামাদকে

প্রকাশকের কথা

ইতিহাসে মানুষের রূপান্তর ও স্বরূপ লিপিবদ্ধ হয়ে থাকে। যে কোনো মানুষ নিজের উৎস, প্রবহমান ধারা ও গন্তব্য নির্ণয় করতে পারে ইতিহাস অধ্যয়ন করে। তাই মানুষের উত্তরাধিকার ও বিকাশধারার সন্ধান ইতিহাসে প্রত্যক্ষ করা যায়। প্রত্যেক জাতির মতো বাঙালি জাতির আছে একটি ইতিহাস। তবে সেই ইতিহাস নিয়ে আছে নানা বিতর্ক। অন্যদিকে বাঙালি মুসলমানের জাতিসত্তার স্বরূপ ও বিবর্তন ইতিহাসে স্পষ্ট আকারে নেই। ফলে শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর কাছেও আমাদের উৎস ও রূপান্তর সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা নেই। অথচ আত্মপরিচয়ের প্রশ্নে বিষয়টি অত্যন্ত জরুরি।

'আত্মপরিচয়ের সন্ধানে' গ্রন্থে আমাদের জাতিসত্তার স্বরূপ, বিকাশধারা, নৃতাত্ত্বিক পরিচয়, ভাষা-সাহিত্য ও সংস্কৃতির রূপান্তর, জাতীয়তাবাদ, রাষ্ট্রচিন্তা, আন্দোলন-সংগ্রাম এবং বিবর্তন সম্পর্কে একটি পরিষ্কার ধারণা দেওয়ার সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন এই সময়ের অন্যতম পণ্ডিত, শিক্ষাবিদ ও কলামিস্ট এবনে গোলাম সামাদ। ইতিহাসের বাঁকে বহুদিনের জমে থাকা অস্পষ্টতা দূর করে একটি জাতির ক্রমধারা ও শেকড় সন্ধান করার মতো দুঃসাহসী, শ্রমলব্ধ ও অত্যন্ত প্রয়োজনীয় একটি কাজ সম্পন্ন করেছেন লেখক। আমরা চাই এই বইটির মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম সঠিক তথ্য ও ধারণা নিয়ে বেড়ে উঠুক এবং দেশপ্রেমে উজ্জীবিত হোক।

বাজারে বইটির দুষ্প্রাপ্যতা ও চাহিদার আলোকে পরিলেখ প্রকাশনী নতুনভাবে প্রকাশ করার উদ্যোগ নিয়েছে। বর্তমান সংস্করণে লেখক তথ্য, উপাত্ত, বক্তব্যসহ সার্বিক দিক থেকে বইটির সংযোজন, পরিমার্জন ও পরিবর্ধন করেছেন। আমরা বইটির বহুল প্রচার কামনা করছি।

আরম্ভের আগে

আমাকে কিছু স্নেহভাজন তরুণ সম্প্রতি অনুরোধ করেছেন, বাংলাদেশের উপর একটা ছোট বই লিখতে। যা পড়ে, পরিচ্ছন্ন হতে পারবে আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে নিজেদের ধারণা। আমি বইটির নাম রাখছি 'আত্মপরিচয়ের সন্ধানে'। কারণ, বইটিতে চেষ্টা করা হবে আমাদের জাতিসত্তার পরিচয় খুঁজে পাবার। আমরা বুঝে দেখতে চাইবো বর্তমান বাংলাদেশের মানুষের আত্মপরিচয়ের বা স্বাতন্ত্র্যবোধের উদ্ভবের বিভিন্ন কারণসমূহকে। আমরা অনুসরণ করব তুলনামূলক ইতিহাস বিচার পদ্ধতি। আমাদের আলোচনার ভাষা হবে ঘরোয়া। কেননা, বইটি লেখা হচ্ছে, বিশেষভাবে সাধারণ জিজ্ঞাসু ব্যস্ত পাঠকের জন্য।

সাথে কৃতজ্ঞতা জানাই বন্ধুবর ওবেইদ জাগীরদারকে, যার আন্তরিকতা ও বন্ধুত্ব আমার পাণ্ডুলিপি তৈরিতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। ধন্যবাদ প্রকাশককে। ধন্যবাদ ওবেইদ জাগীরদার ট্রাস্টকে; যাদের অর্থায়নে পাণ্ডুলিপিটি বই আকারে প্রকাশ পেল। পাণ্ডুলিপি সম্পাদনার মতো কঠিন কাজটি করার জন্য ধন্যবাদ জানাই, আমার ছাত্রপ্রতিম ড. মো. আলতাফ হোসেন ও কথাশিল্পী কথাশিল্পী মঈন শেখকে।

সূ চি প ত্র

প্রথম পরিচ্ছেদ	:	বাংলাদেশের ঠিকানা	১১
দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ	:	বাংলাদেশের মানব পরিচয়	১৭
তৃতীয় পরিচ্ছেদ	:	ইসলামের অবদান	২৮
চতুর্থ পরিচ্ছেদ	:	হিন্দু সমাজের গড়ন	৪০
পঞ্চম পরিচ্ছেদ	:	মুসলমান ও তুর্কী	৪৪
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ	:	সুলতানী ও বাদশাহী আমল	৪৭
সপ্তম পরিচ্ছেদ	:	রাজা রামমোহন রায় ও বাংলার সংস্কৃতি	৫৫
অষ্টম পরিচ্ছেদ	:	বাংলা গদ্যে ইউরোপীয়দের দান	৬২
নবম পরিচ্ছেদ	:	ফারায়েজী আন্দোলন	৬৫
দশম পরিচ্ছেদ	:	সিপাহী অভ্যুত্থান	৭০
একাদশ পরিচ্ছেদ	:	নবাব আবদুল লতিফ	৭৪
দ্বাদশ পরিচ্ছেদ	:	নবাব ফয়জুননেসা চৌধুরানী	৭৭
ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ	:	স্যার সৈয়দ আমীর আলী	৮১
চতুর্দশ পরিচ্ছেদ	:	বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ	৮৬
পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ	:	হিন্দুত্ববাদ	৯২
ষোড়শ পরিচ্ছেদ	:	পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা ও বাংলা ভাগ	৯৭
সপ্তদশ পরিচ্ছেদ	:	পাকিস্তান হবার পরে	১০৮
অষ্টদশ পরিচ্ছেদ	:	রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন	১১০
ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ	:	উনিশশো চুয়ান্নর প্রাদেশিক নির্বাচন	১২৪
বিংশ পরিচ্ছেদ	:	উনিশশো চুয়ান্নর প্রাদেশিক নির্বাচন নিয়ে আরও কথা	১২৮
একবিংশ পরিচ্ছেদ	:	আইয়ুবের শাসনামল	১৩০
দ্বাবিংশ পারিচ্ছেদ	:	শেখ মুজিবের ছয় দফা	১৩৪

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ	:	জুলফিকার আলী ভুট্টু	১৪০
চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ	:	ইয়াহিয়ার আইন কাঠামো আদেশ	১৪৫
পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ	:	জেনারেল আগা মুহাম্মদ ইয়াহিয়া খান	১৫০
ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ	:	কলকাতার স্মৃতি	১৫৩
সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ	:	ইয়াহিয়ার একটি সাক্ষাতকার	১৬৭
অষ্টবিংশ পরিচ্ছেদ	:	১৪ দিনের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ	১৭০
ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ	:	পৃথক স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশ	১৭৬
ত্রিংশ পরিচ্ছেদ	:	মার্কসবাদ লেনিনবাদ	১৯৩
একত্রিংশ পরিচ্ছেদ	:	বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)	২০০
দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ	:	ভারত ও আমাদের জাতীয় সঙ্গীত	২০৫
ত্রয়োত্রিংশ পরিচ্ছেদ	:	তাজউদ্দীন কন্যার স্মৃতিচারণ	২১০
চতুর্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ	:	হাজার বছরের বাঙালি	২১৬
পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ	:	সাবেক পাকিস্তানের চব্বিশ বছর	২২৪
ষষ্ঠত্রিংশ পরিচ্ছেদ	:	ইন্দিরা গান্ধী সম্পর্কে আরও কিছু কথা	২২৮
সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ	:	চীন-ভারত-বাংলাদেশ	২৩১
অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ	:	আমাদের সংস্কৃতি	২৩৯
ঊনচল্লিংশ পরিচ্ছেদ	:	বাংলাদেশে বিহারী	২৪৮
উপসংহার			২৫২
প্রাসঙ্গিক কথা			২৫৫
পরিশিষ্ট			২৫৯

প্রথম পরিচ্ছেদ

বাংলাদেশের ঠিকানা

এই পদ্মা এই মেঘনা, এই যমুনা সুরমা নদী তটে
আমার রাখাল মন গান গেয়ে যায়
এ আমার দেশ এ আমার প্রেম...
কত আনন্দ বেদনা মিলন বিরহ সঙ্কটে।

বাংলাদেশের ঠিকানার কথা বলতে যেয়ে শুরুতেই আমার মনে পড়ছে ১৯৭৩ সালে কবি ও গীতিকার আবু জাফর সাহেবের রচিত বিখ্যাত গানের উপরের লাইন ক'টির কথা। কেননা, এর মধ্যে বিশেষভাবে ধরা পড়েছে বর্তমান বাংলাদেশের মানুষের স্বদেশ চেতনার আবেগ-অনুভব। কিন্তু আমাদের বর্তমান বইয়ের আলোচ্য, বাংলাদেশের মানুষের আত্মপরিচয়। এই পরিচয় পাবার জন্যে আমাদের যেতে হবে ইতিহাসের যথেষ্ট সুদূরে। ইতিহাস বলতে আমরা বুঝবো অতীতের সেইসব ঘটনাকে, যা কাজে লাগে বর্তমানকে বিশ্লেষণ করবার জন্যে। অতীতের সব ঘটনাকে আমরা ইতিহাসরূপে এই বইতে ধার্য করব না।

দেশের নাম ও সীমানা

হিন্দু পৌরাণিক কাহিনি অনুসারে, পুরাকালে কোনো এক রাজার ছিল পাঁচপুত্র। এরা হলেন, অংগ, বংগ, কলিংগ, সুস ও পুণ্ড্র। এদের নাম অনুসারে পাঁচটি রাজ্যের নাম হয়। বংগ যে দেশের রাজা হন তার নাম হয় বংগ।

কারো কারো মতে, (যেমন: ফরাসী বিশেষজ্ঞ, সিলভ্যাঁ লেভি) অংগ, বংগ, কলিংগ প্রভৃতি নামগুলি এসেছে চীনা পরিবারভুক্ত কোনো ভাষা থেকে। দক্ষিণ

চীনের ভাষায় 'কিয়াং' (Kiang) শব্দের অর্থ হলো নদী। দক্ষিণ চীনের একটি নদীর নাম হলো সি-কিয়াং। সি মানে হলো পশ্চিম। সি-কিয়াং মানে হলো পশ্চিম দিক থেকে বয়ে আসা নদী। যদিও নদীটা চীনের দক্ষিণে অবস্থিত। নদীটার উদ্ভব হয়েছে উনান মালভূমিতে। অংগ, বংগ, কলিংগ নামের উদ্ভব ঘটে থাকতে পারে এইসব অঞ্চলের প্রাচীন নদীর নাম থেকে। কারণ, কিয়াং শব্দের অর্থ হলো নদী। কেননা, সাধারণভাবে এইসব স্থানের নামের সঙ্গে যুক্ত থাকছে 'য়ং' ধ্বনি। মনে করা হয় অতীতে দক্ষিণ চীন থেকে মঙ্গোলীয় মানবধারার মানুষ এসে উপনিবিষ্ট হয়েছিল এই সব অঞ্চলে। আর তারা দিয়েছিল এইসব নদীর নাম। চীনা পরিবারের ভাষায় সাধারণভাবেই দেখা যায় যে 'য়ং' ধ্বনি নদীর নামের সাথে যুক্ত থাকতে। যেমন, 'হোয়াংহো'। তিব্বতী ভাষায় ব্রহ্মপুত্র নদের নাম 'সাংপো'। ল্যাপচা ভাষায় তিস্তা নদীর নাম 'দিস্তাং'। অনেকে মনে করেন, তিস্তা নদীর নাম হয়েছে সংস্কৃত 'ত্রিস্রোতা' থেকে। কিন্তু এই ধারণা যথার্থ নয়। দিস্তাং থেকে বাংলাভাষায় তিস্তা নামের উদ্ভব হতে পেরেছে। এটা হলো অধিকাংশ ভাষাতাত্ত্বিকের মতো। তবে এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আমরা বাংলাভাষাতেও চলতি কথায় নদীকে বলি গাং। চীনা পরিবারের ভাষায় আমাদের দেশে রাজবংশী, গারো ও ত্রিপুরীরা কথা বলেন। সম্ভবত এক সময় হয়তো এদেশের অনেক অঞ্চলেই ছিল এদের মতো মঙ্গোলীয় মানবধারার মানুষের বাস। যে কারণেই হোক আজ আর তারা টিকে নেই। কিন্তু থেকে গিয়েছে তাদের ভাষাপরিবার থেকে আসা নাম।

পুরাকালে বাংলাদেশের নানা অংশের নানা নাম ছিল। যেমন, বর্তমান বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের একটা অংশের নাম ছিল বরেন্দ্র। বাংলাদেশের পূর্ব-দক্ষিণাঞ্চলের একটা অংশকে বলা হতো সমতট। কামরূপ বলতে বোঝাত বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলের একটি অংশ ও বর্তমান আসামের পশ্চিম ভাগের একটি অংশকে একত্রে। কিন্তু 'মুলুক বংগালহ' সুলতানী আমলে এসে (খৃষ্ট্রীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে) ফারসি ভাষায় লিখিত একাধিক ইতিহাস বইতে (যেমনঃ সিরত-ই-ফিরোজশাহী) বইতে পাওয়া যাচ্ছে। এ থেকেই পর্তুগিজ ভাষায় নামটা দাঁড়ায় Bengala। আর ইংরেজি ভাষায় Bengal। আর আমরা এখন বলছি বাংলাদেশ।

ভাষাতত্ত্ববিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে 'বঙ্গ' নামের সঙ্গে ফারসি 'অহ' প্রত্যয় যুক্ত হয়ে উদ্ভব হয় 'বঙ্গালহ' নামটি। এ থেকে মধ্যযুগের বাংলাভাষায়

দেশটির নাম দাঁড়ায় 'বাঙ্গালা'। সম্রাট আকবর তার সাম্রাজ্যকে পনেরোটি সুবা বা প্রদেশে ভাগ করেন। যার একটির নাম ছিল 'বংগালহ'। আবুল ফজল তার 'আইন-ই-আকবরী' বইতে লিখেছেন, আগে দেশটির নাম ছিল বংগ'। কিন্তু তারপরে 'আল' শব্দটি যুক্ত হয়ে দেশটির নাম দাঁড়ায় 'বংগাল'। কারণ, এই দেশে মাটি দিয়ে বাঁধ বেধে পানি আটকিয়ে চাষাবাদ করা হয়। এইসব বাঁধকে বলে 'আল'। আবুল ফজল বলেছেন, সে সময় আকবরের অন্য সুবাগুলির চেয়ে বংগাল ছিল সবচেয়ে সমৃদ্ধ। যেখানে খাজনা আদায় করতে বেগ পেতে হতো না। অনেকে খাজনা দিত সোনার টাকায়। খুব বেশিদিন আগের ঘটনা নয়, কবি মাইকেল মধুসূদন (১৮২৩-১৮৭৩) তাঁর 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের প্রস্তাবনায় লিখেছেন,

অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোকে রাঢ়েবঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।

অর্থাৎ কবি মধুসূদনের সময়ও বংগ বলতে প্রধানত বুঝিয়েছে পূর্ব বাংলাকে; পশ্চিম বাংলাকে (রাঢ়) নয়।

আমরা বাংলাদেশ বলতে বোঝাব বর্তমান জাতি-রাষ্ট্র (Nation-State) বাংলাদেশকে। যা এখন জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। যার ভৌগলিক অবস্থান হলো ২০ ডিগ্রি ৩৫ মিনিট ও ২৬ ডিগ্রি ৪৫ মিনিট উত্তর অক্ষরেখা (Latitude) এবং ৮৮ ডিগ্রি ৩ মিনিট ও ৯২ ডিগ্রি পূর্ব ৪-৫দ্রাঘিমা রেখার (Longtitude) মধ্যে। বাংলাদেশের দক্ষিণভাগের একটি অংশের উপর দিয়ে গিয়েছে কর্কটক্রান্তি। গ্রীষ্মকালে সূর্যরশ্মি এখানে খাড়াভাবে পড়ে।

প্রাকৃতিক পরিচয়

বাংলাদেশ নদীমাতৃক। এছাড়া এর বহু জায়গাতেই ছিল এবং এখনও আছে জলাভূমি। হাওড় শব্দটা আরবী ভাষার। যার অর্থ জলাভূমি। নদী-নালা, খাল-বিলে বাংলাদেশে হয়েছে প্রচুর মাছ। বাংলাদেশের মানুষ মাছকে বিশেষভাবে খাদ্যরূপে গ্রহণ করেছে। বাংলাদেশের নদী-নালা, খাল-বিলের ধারে প্রচুর বুনোধান (Oryza sativa Var. fatua, Prain) জন্মায়। উদ্ভিদবিদদের মতে এই বুনোধান থেকে উদ্ভব হতে পেরেছে আবাদী ধানের। বাংলাদেশে মানুষ অনেক প্রাচীনকাল থেকেই আরম্ভ করেছে ধানের আবাদ। আর আহার্য হিসাবে গ্রহণ করেছে ভাত। বাংলাদেশের মানুষের বস্তুগত

সংস্কৃতির ভিত্তি হচ্ছে ভাত-মাছের জীবন। বাংলাদেশের মানুষ অনেককাল আগে থেকেই হয়ে উঠেছে সভ্য। তারা বানিয়েছে কাঠ দিয়ে বড় বড় সমুদ্রগামী নৌকা। গিয়েছে দেশে-বিদেশে বাণিজ্য করতে। বাংলাদেশে এক সময় বহু রকমের নৌকা তৈরি হতো। বাংলাদেশ গ্রীষ্ম প্রধান মৌসুমী জলবায়ুর দেশ। এখানে গ্রীষ্মকালে বৃষ্টি হয়। শীতকালে বৃষ্টি হয় না বললেই চলে। দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী বায়ু (বঙ্গোপসাগর শাখা) এখানে প্রচুর জ্বলীয় বাষ্প বহন করে আনে। ভেজা বাতাস শুকনো বাতাসের চাইতে হালকা। এই হালকা বাতাস হিমালয় পর্বতমালার সঙ্গে ধাক্কা খেয়ে সহজেই উঠতে থাকে উপরে। উপরে উঠার সময় ঠাণ্ডা হয়ে জলীয় বাষ্প থেকে সৃষ্টি হয় মেঘের। যা থেকে হয় প্রচুর বৃষ্টি। কিন্তু বাংলাদেশে সারা বছর বৃষ্টি হয় না। শীতকালে তাই চাষাবাদ করতে গেলে প্রয়োজন হয় সেঁচের পানির। এখন আমরা চেষ্টা করছি শীতকালে সেঁচের পানির সরবরাহ বৃদ্ধি করে ফসলের আবাদ বাড়াতে। প্রসিদ্ধ ভূগোলবিদ ডাডলে স্টাম্প (Sir Dudley Stamp) বৃটিশ শাসন আমলে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের হিসাব অনুসারে এই উপমহাদেশকে চারভাগে ভাগ করেন। ১. ভালো বৃষ্টিপাত অঞ্চল। যেখানে বছরে গড়ে ৮০ ইঞ্চির অধিক বৃষ্টিপাত হয়। এই অঞ্চলে সর্বত্র ধানের আবাদ করা হয়। এই অঞ্চলে হতে দেখা যায় চিরহরিৎ ঘন বন। এইসব বনে দেখা যায় গর্জন গাছের (Dipterocarpus terbinatus) মতো উঁচু উঁচু পাতা না ঝরা গাছ। বাংলাদেশের বেশির ভাগ অঞ্চলই পড়ে ভালো বৃষ্টিপাত অঞ্চলের মধ্যে। ২. মাঝারি বৃষ্টিপাত অঞ্চল। এই অঞ্চলে বছরে গড়পড়তা বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হলো ৪০ থেকে ৮০ ইঞ্চির মধ্যে। এই অঞ্চলে অনেক রকম ফসল সেঁচের পানি ছাড়াই আবাদ করা যায়। এই অঞ্চলে দেখা যায় শালগাছের (Shorea robusta) বন। শীতকালে যাদের পাতা ঝরে যায়। ৩. স্বল্প বৃষ্টিপাত অঞ্চল। এখানে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হলো ২০ থেকে ৪০ ইঞ্চির মধ্যে। এই অঞ্চলকে বলা চলে শুষ্ক অঞ্চল (Dry-zone)। এখানে আবাদ করা হয় দেও-ধানের (জোয়ার) মতো ছোট দানার ফসল। আবাদ করা হয় চীনা ও কাওনের। এখানে ঘন বনভূমি হতে দেখা যায় না। এসব স্থানে ধানের মতো ফসল আবাদ করতে হলে প্রয়োজন হয় সেঁচের পানির। এখানে পাহাড়ি অঞ্চলে কোনো বনভূমি হতে দেখা যায় না। হতে দেখা যায় ছোট ছোট কাঁটা গাছের ঝোপ। ৪. মরু ও আধা মরুময় অঞ্চল। এখানে বার্ষিক গড় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হয় ২০ ইঞ্চির কম। এখানে কোনো ফসল সেঁচের পানি ছাড়া উৎপন্ন করা চলে না। (১ ইঞ্চি = ২৫ মিলিমিটার)।

বাংলাদেশ ছিল নদীমাতৃক দেশ। কিন্তু ভারতের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে বয়ে আসা ৫৪ ছোট বড় নদীর পানি এখন এককভাবে ভারত বিশেষভাবে নিয়ে নিতে চাচ্ছে। ঘটতে যাচ্ছে পানির অভাব। কিন্তু আমরা যদি বর্ষার পানি ধরে রাখবার ব্যবস্থা করতে পারি তবে তা দিয়েও আমরা শীতকালে ধান ও চৈতালী ফসলের আবাদ করতে পারব। বাংলাদেশ মরুভূমি অঞ্চলে পরিণত হবে না। যদিও আমাদের জীবন আগের তুলনায় হতে চাইবে অনেক শ্রমসাধ্য। আমাদের দেশের কোনো অঞ্চলেই বছরে ২০ ইঞ্চির কম বৃষ্টিপাত হয় না। তাই ভারতের পক্ষে কেবল নদীর পানি আটকিয়ে বাংলাদেশকে মরুভূমিতে পরিণত করা সম্ভব হবে না। বাংলাদেশের অর্থনীতি ছিল এবং এখনও হয়ে আছে মূলত দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু-নির্ভর। ঠিক সময় বৃষ্টি না হলে এখানে দেখা দেয় খরার সমস্যা। যে কারণে হতে পারে খাদ্যাভাব, এমনকি দুর্ভিক্ষ। বাংলাদেশের অনেক অঞ্চলে পাঁচ বছর পরপর খরার সৃষ্টি হয়।

বাংলাদেশে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। তবে সারা বছর হয় না। এখানে জুন থেকে অক্টোবর মাসের মধ্যে সবচেয়ে বেশি বৃষ্টি হয়। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বাতাস এ সময় সমুদ্র থেকে প্রচুর জ্বলীয়বাষ্প বহন করে আনে। আমাদের দেশে তাপমাত্রা ও সূর্যের আলো সব সময় থাকে ফসল হবার উপযোগী। ফসলের ফলন এখানে তাই বিশেষভাবে নির্ভর করে প্রধানত বৃষ্টিপাতের উপর। আমাদের দেশের অনেক অঞ্চলে গড়পড়তা পাঁচ বছর পরপর সৃষ্টি হয় খরার সমস্যা। বাংলাদেশের অধিকাংশটাই গড়ে উঠেছে নদীবাহিত পলিমাটির দ্বারা। ভূমি এখানে পাহাড়ি নয়। তাই সহজেই চাষাবাদ করা চলে। ভূ-তাত্ত্বিকদের মতে বাংলাদেশের অধিকাংশ জায়গায় ৫, ৬ লাখ বছর আগেও ছিল অগভীর সমুদ্র। কিন্তু মানুষের মতো প্রাণীর আবির্ভাব এর অনেক আগেই হতে পেরেছে। অন্যত্র থেকে মানুষ এখানে এসে অনেক পরে গড়েছে জনপদ। আগে মনে করা হতো, মানুষ নদী তীরে প্রথম জনপদ গড়ে তোলে নদীর পানি দিয়ে কৃষিকাজ করবার জন্যে। কিন্তু এখন মনে করা হয়, নদীর ধারে মানুষ প্রথমে জনপদ গড়েছে মাছ ধরে খাবার সুবিধার কারণে। মাছ ধরে খাবার সুবিধার জন্য মানুষ নদীর ধারে প্রথমে গড়ে তুলেছে স্থায়ী জনপদ। পরে নদীর পানির সুবিধাকে কাজে লাগিয়ে সেখানে আরম্ভ করেছে কৃষি। মানুষ লাঙল আবিষ্কারের অনেক আগেই করেছিল তামা দিয়ে তৈরি বড়শি। যার প্রমাণ অনেক জায়গা থেকে মাটি খুঁড়ে পাওয়া গিয়েছে। কৃষি নয়, ধিবর জীবন দিয়েই সম্ভবত আরম্ভ হয়েছিল প্রাচীন বাংলাতেও জনপদের সূচনা।

দেশের মাটি

বাংলাদেশের মাটি প্রায় সবই নদীবাহিত পলিমাটির শ্রেণির আন্তর্গত। এদেশকে নদীমাতৃক দেশ বলে; কারণ, অসংখ্য ছোট বড় নদী এরমধ্য দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। বহুদূর থেকে ধোয়া মাটি এই সব নদীর স্রোতে ভেসে এসে পলি রূপে জমা হয়েছে। এবং এখনও হচ্ছে। কেবল চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু জমিকে বলা যেতে পারে স্থিতিশীল মাটি। বাংলাদেশের পলিমাটিকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। একভাগকে বলা চলে পুরনো পলিমাটি, আর একভাগকে বলা যায় নতুন পলিমাটি। পুরনো পলিমাটির রং লালাচে। যেমন বরেন্দ্র অঞ্চলের পলিমাটি। এই পলিমাটির মধ্যে লোহা মরচে ধরার জন্যে মাটি লালচে হয়ে উঠেছে। ঢাকার কাছে অবস্থিত মধুপুর গড় অঞ্চলের মাটিও লালচে। লালমাটির কিছু অঞ্চল বাংলাদেশের কুমিল্লা অঞ্চলেও দেখা যায়। যেমন: লালমাই। অবশিষ্ট সব পলিমাটি অঞ্চলকে বলা যায় অল্পবিস্তর নতুন। সুন্দরবন ও চট্টগ্রাম বিভাগের সমুদ্র উকূলবর্তী পলিমাটি হলো সর্বাপেক্ষা নবীন পলিমাটি। স্থিতিশীল মাটি ও পুরাতন পলিমাটির মিলিত পরিমাণ অপেক্ষা নতুন পলিমাটির পরিমাণ অনেক বেশি। পুরাতন পলিমাটিতে চুন ও ফসপেটের পরিমাণ কম, কিন্তু পটাশের পরিমাণ বেশি থাকে। এই মাটি সাধারণত হয় অম্লাত্মক। নতুন পলিমাটি, যেমন পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র, মেঘনা, শীতলক্ষ্যা প্রভৃতি নদীবাহিত পলিমাটি সরস ও হালকা। সব নদীর পলিমাটি সমান উর্বর নয়। পদ্মার পলিমাটি আর সব পলিমাটির তুলনায় বেশি উর্বর। বাংলাদেশের অধিকাংশ জমি সমতল। সমতল ক্ষেত্রে যেসব শস্য উৎপন্ন হয়ে থাকে, তাদের মধ্যে ধান, পাট, গম, ইক্ষু, ভুট্টা, গোলআলু, বিভিন্ন প্রকার ডাল শস্য প্রধান। পৃথিবীতে এই রকম নদী বিধৌত সমতল ভূমি খুব কমই আছে। বাংলাদেশে যদি সেঁচের পানির অভাব না হয় এবং ভারত যদি নদীর পানি একতরফাভাবে না নিতে পারে, তবে অনেকের মতে বাংলাদেশ হতে পারে সমগ্র উপমহাদেশের খাদ্যভাণ্ডার। কিন্তু যেহেতু ভারত এখন তার মধ্যদিয়ে বয়ে আসা বাংলাদেশের ৫৪টা নদীর পানি একতরফাভাবে নিয়ে নিতে চাচ্ছে, তাই তার ফলে বাংলাদেশের সাবেক ভৌগলিক অবস্থা অনেক পরিমাণে ভিন্ন হয়ে উঠতে যাচ্ছে। সারা বিশ্বে পরিবেশবাদীরা বলছেন পৃথিবীকে সবুজ রাখতে হবে। পৃথিবীকে সবুজ রাখতে হলে সর্বত্র সেঁচের পানির সরবরাহকে দিতে হবে গুরুত্ব।